



মার্চ-এপ্রিল ২০১৪

কোয়ান্টাম বুলেটিন

নবনির্মিত শাফিয়ানে চিকিৎসাসেবা শুরু

উদ্বোধন করলেন শিশুবন্ধু ডা. এম আর খান



বরণ্য পদার্থবিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী মহাকাশ গবেষণায় ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দিতে হবে

৭ মার্চ, শুক্রবার কোয়ান্টাম-এর নবনির্মিত চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ান উদ্বোধন করলেন কিংবদন্তী শিশু চিকিৎসক ও শিশুবন্ধু জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ তিনজন সফরসঙ্গী নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো কোয়ান্টাম সফর করেন।

গাছপালা, পাহাড় আর অনুপম নিসর্গ শোভিত কোয়ান্টাম-এর বরকত ভ্যালিতে মাত্র দুমাসে নির্মিত হয়েছে কোয়ান্টাম চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ানের নতুন ভবন। অর্ধ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত ৮,২১১ বর্গফুট বিশিষ্ট শাফিয়ানে প্রতিদিন আউটডোর ও জরুরি চিকিৎসার পাশাপাশি সংযোজিত হয়েছে একটি শিশু ওয়ার্ড-ডা. এম আর খান শিশু ওয়ার্ড। ৮ মার্চ বাংলাদেশে শিশু চিকিৎসার পথিকৃৎ জাতীয় অধ্যাপক ডা. এম আর খান নিজেই এটি উদ্বোধন করেন।

এ সময় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের ক্ষুদ্র শিক্ষার্থীরা তাকে সেখানে অভ্যর্থনা জানায়। উল্লেখ্য, এ বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম পরিবারের ৯৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অংশগ্রহণে ৪,২১৯ জন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে নবনির্মিত শাফিয়ানে চিকিৎসা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়।

শাফিয়ান-কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এর সার্বিক চিকিৎসা কার্যক্রম ও আনুষঙ্গিক নানা দিক নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দেন ডা. এম আর খান। তারপর তার নেতৃত্বে একটি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে দুস্থ শিশুদের চিকিৎসাসেবা ও বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেয়া হয়।

এর আগে শহীদ ময়দানে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় অনবদ্য প্যারেড, ব্যান্ডবাদন ও ডিসপ্লে উপভোগ করেন অতিথিবৃন্দ।

৮ মার্চ সকালে স্থানীয় দুটি কালভার্ট পরিদর্শন করেন ডা. এম আর খান, যা নির্মাণে তিনি পালন করেছেন সক্রিয় ভূমিকা। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে প্রথমবার কোয়ান্টাম সফরকালে এখানকার যাতায়াতের অসুবিধা দেখে তিনি পরবর্তীতে এ কালভার্ট দুটি নির্মাণে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। যার ফলশ্রুতিতে ২০১৩ সালে সম্পন্ন হয় ৩৬ ফুট দীর্ঘ লম্বাখোলা কালভার্ট ও ৮৭ ফুট দীর্ঘ কোয়ান্টাম কসমো স্কুল সংযোগ সেতু এবং ৪৭৫ ফুট দীর্ঘ স্বাগতায়ন-কসমো স্কুল আবাসিক সংযোগ সড়ক।

৮ মার্চ, ২০১৪। কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে দিনটি ছিলো একটি চমকপ্রদ ও বিশেষ দিন। স্কুল প্রাঙ্গণে তারাভরা রাতের আকাশের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দসহ অশেষায়ন কার্যক্রমে অংশ নেয়া কোয়ান্টাম পরিবারের দূশতাধিক সদস্য।

হঠাৎ রাতের অন্ধকার ভেদ করে অজস্র আলোর বলকানি। পুরো গিরি ফিকরান এলাকা বলমল করে উঠলো রঙিন আলোয়। একদিকে আলোকময় সৌরজগত আর মহাকাশায়নের রেপ্লিকা, অন্যদিকে চারকোণা মঞ্চের ওপর একটি সত্যিকারের টেলিস্কোপ!

এভাবেই এক রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করলো কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের মহাকাশ গবেষণা কার্যক্রম। আর এটি উদ্বোধন করলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পদার্থবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, লেখক ও গবেষক ড. এম শমশের আলী।

পুরো ব্যাপারটিতে অভিভূত এ বরণ্য বিজ্ঞানী বলেন, সকাল থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে, দিনের শেষে একটা কোনো চমক আছে। সত্যিই, মহাকাশ যেমন বিরাট বিস্তৃত, আজকের এ মুহূর্তের এই চমকও আমার কাছে তেমনি অনেক বড়। তিনি বলেন, বিজ্ঞানের যেকোনো শাখায়

গবেষণা ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের জন্যে চাই গণিতে বিশেষ দক্ষতা, জ্ঞান ও আগ্রহ। আমি স্বপ্ন দেখি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার পাশাপাশি এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা একদিন নাসা-য় কাজ করবে, মহাকাশ গবেষণায় ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে।

আজ এখানে সীমিত পরিসরে যে মহাকাশ গবেষণা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হলো তার ফল কেবল আমাদের জাতীয় জীবনেই নয়, সারা বিশ্বেই দূরপ্রসারী ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করবে।

এরপর টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ দর্শন কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন তিনি। এ পর্যায়ে মহাকাশ অভিযান বিষয়ক দুটি ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। উল্লেখ্য, এখন থেকে দুটি অত্যাধুনিক টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ দর্শনের ব্যবস্থা থাকবে কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্যে।

কোয়ান্টাম মেথড

৩৭৩ তম কোর্স

১১, ১২, ১৩ ও ১৪ এপ্রিল

ভেন্যু : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

QUANTUM the SCIENCE of LIVING

প্রখ্যাত লালন সংগীতশিল্পী ফরিদা পারভীন। গত চার দশক ধরে শুধু দেশেই নয়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ফরির লালনের বাণী ও সুরকে পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তার অবদান বহুল স্বীকৃত। সংগীতে বিশেষ অবদানের জন্যে রাষ্ট্রীয় একুশে পদকসহ দেশে-বিদেশে বহু পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন তিনি। বিশিষ্ট এ সংগীত-ব্যক্তিত্ব সম্প্রতি কোয়ান্টাম মেথডের ৩৬৮ ব্যাচে অংশ নেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার বৈচিত্র্যময় সংগীত জীবনের নানা দিক এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়ে তার আশা ও উপলব্ধির কথা।

লালনের মানবপ্রেমের বাণীর মর্মার্থ উপলব্ধি করেছি কোয়ান্টামে এসে

ফরিদা পারভীন



গান নিয়ে আমার জীবনে রয়েছে অসংখ্য স্মরণীয় ঘটনা আর আনন্দের স্মৃতি। ১৯৮৪ সালে একবার সুইডেন গিয়েছি, রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে। সুইডেনের রানী আমাদেরকে তার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে লালনের একটা গান করলাম-‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি...’। আমি গাইছি, আর রানী হাউমাউ করে কাঁদছেন। অনুষ্ঠানে অন্য যারা ছিলেন তাদেরও চোখ অশ্রুসিক্ত।

আমি খুব অবাক হলাম, রানী তো আমার গানের ভাষা বুঝতে পারছেন না। গানটা শেষ হলে তিনি কেবল একটা কথাই বললেন, ‘আমি ওর ভাষা জানি না। কিন্তু ওর গায়কী আর সুরের যে অতল গভীরতা-তাতে আমার মনে হলো, ওর কণ্ঠের মধ্যে ঈশ্বর বাস করছেন। ওর সুরের মধ্যে একটা কষ্ট লুকিয়ে আছে, যা আমার কণ্ঠের সাথে মিলে গেছে।’

ছোটবেলা থেকেই গানের প্রতি আমার গভীর প্রেম। আমি যখন খুব ছোট, আমার মা ঘুম-পাড়ানোর সময় গুণগুণ করে গান শোনাতেন। সেই থেকেই বুঝি গানটা আমার ভেতরে ঢুকে গেছে। গান সবসময় আমার মুখে লেগেই থাকতো। পড়ছি, খেলা করছি, কোনো কাজ করছি, কিন্তু সুরটা ভেতরে আছেই।

আমার বয়স তখন চার/ পাঁচ বছর, আমরা মাগুরায় থাকি। পার্শ্ববর্তী কয়েকটা বাড়িতে হারমোনিয়াম আছে, তার সুর আমাদের খুব টানে। একরাতে আমাকে বাড়িতে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক বাড়িতে হারমোনিয়াম বাজছে, আর আমিও আত্মবিস্মৃতের মতো ওই রাতের বেলা ঝোপঝাড়-জংলা পেরিয়ে ওদের জানালার কাছে গিয়ে চুপচাপ শুনছি। এদিকে, কোথাও খুঁজে না পেয়ে মা ঠিকই বুঝলেন-ওদিক থেকে হারমোনিয়ামের শব্দ আসছে, আমি ওখানেই গেছি। বাবাকে পাঠালেন। দেখা গেল, আমি যথারীতি ওখানেই!

একসময় মনে হলো, আশেপাশে যাদের হারমোনিয়াম আছে, তারা যেভাবে ইচ্ছে ভুলভাল বাজায়, বেসুরে গায়; অথচ আমি গান ভালবাসি, একটা হারমোনিয়াম পেলে কত ভালবেসেই না বাজাতাম! কিন্তু আমার হারমোনিয়াম নেই। ভীষণ অভিমানে হলো। বাবাকে বললাম, একটা হারমোনিয়াম আমার চাই-ই চাই। ওটা না পাওয়া পর্যন্ত আমি পড়াশোনা খাওয়া গোসল কিছুই করবো না। অগত্যা কী আর করা! বাবা কলকাতা থেকে যন্ত্রপাতি আনিয়ে কারিগর দিয়ে একটা হারমোনিয়াম বানিয়ে দিলেন। যদিও আমি তখন এতই ছোট যে, হারমোনিয়ামের একদিক ধরলে অন্য দিকটার নাগাল পাই না।

সেই হারমোনিয়ামটা আমার এখনো আছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাড়ি থেকে চলে যেতে হয়েছিলো, তখন সাথে আর কিছুই নিই নি, শুধু হারমোনিয়ামটা ছাড়া। একসময় মাটির নিচে পুঁতেও রেখেছিলাম, ওটা দেখে পাকিস্তানি মিলিটারি যদি আবার আমাকে রেডিও-তে গান গাইতে নিয়ে যায়, সেই ভয়ে!

শৈশবে আমি বিভিন্ন গুস্তাদের কাছে গান শিখেছি। তখন আমি নজরুলগীতি করতাম। পাশাপাশি আধুনিক গান, উচ্চাঙ্গ সংগীতেরও চর্চা ছিলো। ‘৬৮ সাল থেকে রাজশাহী বেতারের একজন তালিকাভুক্ত নজরুল সংগীতশিল্পী হিসেবে গান করেছি। দেশাত্মবোধক গানও করতাম, যার মধ্যে ‘এই পদ্মা, এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে...’ গানটি আজও খুব জনপ্রিয়।

বাবার ছিলো বদলির চাকরি। একসময় আমরা কুষ্টিয়ায় এসে স্থায়ী হলাম। কুষ্টিয়াকে তখন বলা হতো বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উৎসবে গাইতাম। কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় ছিলো লালন সাঁইজির আখড়া। তার জীবদ্দশায় প্রতিবছর দোল পূর্ণিমাতে সব শিষ্যদের নিয়ে তিনি একটি মহাসমাবেশ করতেন, সেটাও এখন লালন মেলা হিসেবে পরিচিত।

১৯৭৩ সালের কথা। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েটে পড়ি। সে বছর লালন মেলায় গান করার প্রস্তাব পেলাম। আমার খুব একটা আগ্রহ ছিলো না, তবু বাবার উৎসাহে গাইতে রাজি হলাম। কিন্তু লালনের গান গাওয়ার আগে তো শিখতে হবে। মোকহেদ আলী সাঁইয়ের কাছে তালিম নিতে শুরু করলাম, তিনি

আমাকে একটা গানই শেখালেন-‘সত্য বল সুপথে চল, ওরে আমার মন/ সত্য সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দরশন...’।

উৎসবের দিন গানটা গাইলাম। শ্রোতারা সবাই খুব পছন্দ করলেন। অনুরোধ করলেন আরো গাইতে। ওদের বললাম, ‘লালনের এই একটা গানই আমি শিখেছি, পরের বছর আরো শিখে এসে গাইবো’। সংগীতের সাথে আমি কোনো প্রতারণা করতে চাই নি, তাই সেদিন সত্য কথাটা সহজভাবে বললাম- লালনের আর কোনো গান আমি জানি না।

সেদিন অনুষ্ঠানে যখন গানটা গাইছিলাম, এর কথাগুলো আমাকে খুব আলোড়িত করছিলো। একটা শিহরণ অনুভব করছিলাম। কেউ যেন আমার ভেতর থেকে বলছিলো-‘তুমি এই গানই করো’। রাতে বাড়ি ফিরে, ঘুমুতে গিয়েও মনের মধ্যে সেই একই অনুরণন, একই ইঙ্গিত-‘তুমি লালন সাঁইজির গান করলে ভালো করবে, এটাই করো।’

আজ মনে হয়, এর সবই বুঝি পরম করুণাময়ের ইচ্ছা। এ হয়তো তাঁরই অভিপ্রায় যে, আমি লালনের গান করবো। কারণ, একটি গানই আমি শিখলাম, তার কথাগুলো আমাকে এতটা প্রভাবিত করলো! সেই থেকে আমি মূলত লালনের গানই করছি। সাঁইজির গান গেয়ে আমি পেয়েছি আমার দেশের মানুষের অকুণ্ঠ ভালবাসা আর সম্মান। এছাড়াও ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বহু দেশে লালনের গান করেছি, নানা বর্ণের নানা ভাষার অগণিত মানুষ তন্ময় হয়ে শুনেছেন তার গান। আমি চেষ্টা করেছি মাত্র, বাকিটা স্রষ্টার করুণা।

আমার এক জাপানী ছাত্রীর আমন্ত্রণে একাধিকবার জাপানে গিয়েছি। সেখানে ওরা ‘ফরিদা পারভীন প্রজেক্ট কমিটি’ নামে একটি কার্যক্রম শুরু করেছে, যার আওতায় জাপানের বিভিন্ন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি লালনের গান শুনিয়েছি, লালন-দর্শনের বৈচিত্র্যময় দিক নিয়ে কথা বলেছি। এর স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৮ সালে আমাকে ‘ফুকুওকা এশিয়ান কালচার অ্যাওয়ার্ড’-এ ভূষিত করা হয়, যা আগে পেয়েছিলেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর, গুস্তাদ আমজাদ আলী খান, নুসরাত ফতেহ আলী খানের মতো প্রখ্যাত সংগীত-ব্যক্তিত্বরা।

লালনের গানে আছে মানবপ্রেমের কথা, ক্ষমার দৃষ্টিভঙ্গি, আছে আত্মশুদ্ধির প্রেরণা-কোয়ান্টামে এসেও আমি এই চিরায়ত সত্য আর আলোকিত জীবন-দর্শনের প্রতিধ্বনি খুঁজে পেলাম। গুরুজীর কথায় আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়েছি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের পুরোটা সময় দেখেছি, গুরুজী প্রতিটি দিন সময়মতো সবকিছু করেছেন। আমার মনে হলো, তিনি যেন আমাদের বুঝিয়ে দিতে চাইলেন যে, মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস-লালন যেমন বলেছেন, সময় গেলে সাধন হবে না...।

‘ভজ মানুষের চরণ দুটি/ নিত্যবস্ত হবে খাঁটি/ মরিলে সব হবে মাটি/ তুরা এই ভেদ লও জেনে/ সহজ মানুষ, ভজে দেখনা’র মন দিব্যজ্ঞানে...’। কোয়ান্টামে এসে লালনের এ কথাগুলোর মর্মার্থ আমি বার বার উপলব্ধি করেছি। আসলে ‘সহজ’ মানুষ হওয়াটা কিন্তু অনেক কঠিন। কোয়ান্টামের শিক্ষা এই কঠিন কাজটিকেই অনেক সহজ করে দিতে পারে।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও অনুলিখন : ডা. আতাউর রহমান

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সালাম নিবেন। আমি একজন নিরুপায় অসহায় হিসেবে আপনার সাহায্য প্রত্যাশায় এই পত্র লিখলাম। সমস্যাটা হওয়ার পর থেকে কেন যেন মন বার বার চাইছে আপনাকে কিছু কথা বলে নিজেকে হালকা করি।

গুরুজী, মানুষকে বিশ্বাস করা যদি পাপ হয়, সেই পাপটা আমি করেছি; মানুষকে ভালবাসা যদি ভুল হয়, সেই ভুলটা আমি করেছি।

কিছুদিন আগে এক ব্যক্তি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্য পরিচয়ে প্রথমে আমার সাথে বন্ধুত্ব এবং পরবর্তীতে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে। সে আমাকে অনেক রকম স্বপ্ন দেখাতো, বিশ্বাসের কথা বলতো, গুরুজীর বাণী সবসময় আমাকে শোনাতে।

আমি তাকে মানুষ হিসেবে অন্যরকম ভাবে গুরু করলাম। বুঝতে শুরু করলাম, কোয়ান্টাম মেডিটেশন মানুষের চরিত্রকে অনেক উন্নত করে। গুরুজীর বাণী তার মুখ থেকে শুনতে শুনতে তার ভক্ত হয়ে গেলাম এবং তাকে খুব পবিত্র মানুষ ভাবে শুরু করলাম।

কিন্তু গুরুজী, আপনি শুনে অবাক হবেন, যাকে আমি লোভ-লালসার উর্ধ্ব মনে করতাম, সেই মানুষটি যে এত হিংস্র আর অমানবিক হতে পারে, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে জামিনদার হিসেবে ব্ল্যাংক একটি চেক-এ সুকৌশলে

স্বাক্ষর নেয়। তারপর তাতে পাঁচ কোটি টাকা নিজে লিখে চেক ডিজ-অনার করিয়ে মামলা করার উদ্যোগ নেয় এবং জোরপূর্বক আমার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পায়তারা শুরু করে।

এ সমস্যার কথা জানাজানি হওয়ার পর বেশ কয়েকজন আমাকে জানায় যে, তারাও ওই ব্যক্তির কাছ থেকে একইভাবে প্রতারিত হয়েছে। বর্তমানে

যাকে আমি লোভ-লালসার উর্ধ্ব মনে করতাম, সেই মানুষটি যে এত হিংস্র আর অমানবিক হতে পারে, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। এই ব্যক্তি আমার কাছ থেকে জামিনদার হিসেবে ব্ল্যাংক একটি চেক-এ সুকৌশলে স্বাক্ষর নেয়। তারপর তাতে পাঁচ কোটি টাকা নিজে লিখে চেক ডিজ-অনার করিয়ে মামলা করার উদ্যোগ নেয় এবং জোরপূর্বক আমার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার পায়তারা শুরু করে।

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি ও শ্রদ্ধেয়া মা-জী ভালো আছেন।

এর মধ্যে আমার জীবনে একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে, যেটা আমি এখনো ভুলতে পারছি না। আমার চোখের সামনে সবকিছু এখনো ভাসছে।

গুরুজী, সেদিন সকালবেলা আমার ক্লাস ছিলো। তারপর আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে বাণিজ্য মেলায় গেলাম। ওখান থেকে এসে স্টার কাবাবে খেললাম। তারপর সন্ধ্যা ৬.৩০টায় বাসায় গিয়ে দেখি, আম্মু আমার ছোট বোনকে নিয়ে বাণিজ্য মেলায় গেছে। বাসার চাবি আমার কাছে ছিলো না। এদিকে একটা ছেলে সকাল থেকে আমাকে নন-স্টপ ফোন দিয়ে যাচ্ছিলো। এর আগেও অনেকদিন সে ফোন দিয়েছিলো শুধু দেখা করার জন্যে।

আমি ভাবলাম, আম্মুর যেহেতু অনেক দেরি হবে সেহেতু দেখা করি। পিংজা হাট-এ গেলাম। ছেলেটি দুইটি বিগ সাইজ পিংজা ও একটি মিডিয়াম সাইজের পিংজা অর্ডার দিলো। মিডিয়াম সাইজেরটা টেবিলে এবং বাকি দুইটা পিংজা পার্সেল করতে বললো। তারপর সে বললো তার এক ভাই নিচে আছে, পার্সেলটা নিচে দিয়ে আসবে এক মিনিটের মধ্যে। এদিকে এক মিনিট দুই মিনিট করে সময় পার হচ্ছে, কিন্তু আসছে না। আমার ফোনে চার্জ ছিলো না। পিংজা হাট-এর ফোন থেকে কল করলাম। তার ফোন অফ। বুঝলাম, আমি প্রতারিত হয়েছি।

বিল এসেছে ৪,২২০ টাকা। এক পরিচিত বড় ভাইকে ফোন দিলাম। সে অনেকক্ষণ পরে এলো। তার কাছে মাত্র ৭০০ টাকা ছিলো। রেস্টুরেন্ট কর্তৃপক্ষকে বললাম, ৭০০ টাকা ও জাতীয় পরিচয়পত্র জমা রাখতে। কিন্তু পিংজা হাট-এর ম্যানেজার রাজী হলো না। তারপর সেই বড় ভাই নিচে গিয়ে তার ফোনও অফ করে দিলো।

তারপর সে বললো, তার এক ভাই নিচে আছে, পার্সেলটা নিচে দিয়ে আসবে এক মিনিটের মধ্যে। এদিকে এক মিনিট দুই মিনিট করে সময় পার হচ্ছে, কিন্তু আসছে না। আমার ফোনে চার্জ ছিলো না। পিংজা হাট-এর ফোন থেকে কল করলাম। তার ফোন অফ। বুঝলাম, আমি প্রতারিত হয়েছি

... অনেক কান্নাকাটি করলাম।

ওখানকার ম্যানেজার পুলিশ ডাকলেন। পুলিশ এসে উল্টাপাল্টা ব্যবহার করতে থাকলো। আমাকে খারাপ মেয়ে হিসেবে ট্রিট করলো। আমাকে দিয়ে একটা কাগজে সবকিছু লিখিয়ে রাখলো। আমার ফোন রেখে দিলো। নিজেকে এত একা মনে হচ্ছিলো!

বাসায় ফোন দিতে পারছিলাম না, কারণ একটা ছেলের সাথে এসেছি জানলে অনেক সমস্যা হতো। ফোনে চার্জও ছিলো না। ওখানেই অনেক কান্নাকাটি করলাম। ওখানকার ম্যানেজার পুলিশ ডাকলেন। পুলিশ এসে উল্টাপাল্টা ব্যবহার করতে থাকলো।

মেডিটেশন এবং কোয়ান্টামের বিভিন্ন ধর্মীয় বাণীর কথা বলে মানুষকে দুর্বল করা এবং প্রতারণার মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে টাকা আত্মসাৎ করা তার নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গুরুজী, আমি কি পাঁচ কোটি টাকার মানুষ নাকি সে নিজে পাঁচ কোটি টাকার মানুষ? নাকি ব্যাংকের কোনো ক্ষমতা আছে একটি চেক-এ পাঁচ কোটি টাকা পেমেন্ট করার? নাকি আমাদের কারো পক্ষে বাৎসরিক হিসাবে দেখানো সম্ভব যে, আমাদের মধ্যে পাঁচ কোটি টাকার অধিক লেনদেন হয়?

আমার ব্যাংক ম্যানেজার অবাক হয়েছেন এবং যে ব্যাংকের মাধ্যমে সে চেক পাঠিয়েছে, সেই ব্যাংকের ম্যানেজারও দুঃখ প্রকাশ করেছেন এমন ঘটনার জন্যে। তারাও বিশ্বাস করতে পারছেন না মানুষ কীভাবে এত লোভী আর অমানবিক হয়।

গুরুজী, এদের মতো দুষ্ট প্রতারক লোকেরা আপনার মহতী প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট করছে। এরা মেডিটেশন আর ধর্মের কথা বলে ওপরে সাধু সাজলেও এদের ভেতরে অমানুষের আত্মা। এদের মুখোশ খুলে দিতে হবে এবং এদের প্রতিহত করতে হবে সমাজকে রক্ষা করার জন্যে।

গুরুজী, সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি যে, বিষয়টি আপনি দেখবেন। কারণ আমি চাই না-এদের মতো প্রতারক কোয়ান্টামের পরিবেশ নষ্ট করুক। আপনি আমার জন্যে দোয়া করবেন যেন এই মুসিবত থেকে বের হতে পারি।

আপনার দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

(পরিচয় প্রকাশ করা হলো না)

আমাকে খারাপ মেয়ে হিসেবে ট্রিট করলো। আমাকে দিয়ে একটা কাগজে সবকিছু লিখিয়ে রাখলো। আমার ফোন রেখে দিলো। নিজেকে এত একা মনে হচ্ছিলো! এত অসহায় বোধ করছিলাম যে, বলার মতো না।

বাসায় এলাম রাত ১১.৩০টায়। আম্মুকে সব খুলে বললাম। শুনে আম্মু অনেক কষ্ট পেলো। শুধু ছেলের জায়গায় মেয়ের কথা বললাম। আম্মু শুধু বললো, আমি ফোনে আম্মুকে জানালাম না কেন? আম্মু টাকা নিয়ে ওখানে চলে যেত।

পরের দিন সব টাকা (৪,২২০ টাকা) দিয়ে এলাম পিংজা হাট-এ। আমার একটা শিক্ষা হয়েছে। ঐ ছেলের বাসা পরিবর্তন হয়েছে, ফোনও অফ।

দোয়া করবেন গুরুজী, এরকম প্রতারণার শিকার আর কেউ যেন না হয়।

(পরিচয় প্রকাশ করা হলো না)

কোয়ান্টাম কনিকা

কারো সাথে আর্থিক বা ব্যবসায়িক লেনদেন করার আগে তার অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে ভালোভাবে খোঁজখবর নিন। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সবসময় লিখিত প্রমাণপত্র রাখুন।

আপনাকে ব্যবহার করে সুযোগ নিতে চায়-এমন স্বার্থান্বেষীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ পেলেন চার সহস্রাধিক রোগী

**৯৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে
সেবা পেয়েছেন ৪,২১৯ জন রোগী**

২১ ফেব্রুয়ারি বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম-এ অনুষ্ঠিত হলো এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় মেডিকেল ক্যাম্প। নবনির্মিত চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ানে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী এ ক্যাম্প অংশ নিয়েছেন ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা কোয়ান্টাম পরিবারের ৯৩ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ পেয়েছেন ৪,২১৯ জন রোগী। আর সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যার দিক থেকে এটি সর্ববৃহৎ মেডিকেল ক্যাম্প।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডা. এ বি এম ইউনুসের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এ মেডিকেল ক্যাম্পে ভিন্ন ভিন্ন বুথে মোট ১৮ ধরনের বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা প্রদানের ব্যবস্থা ছিলো। যেমন : মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, কার্ডিওলজি, রিউম্যাটোলজি, হেমাটোলজি, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি, নিউরোলজি, নিউরোসার্জারি, শিশু, দন্ত, চর্মরোগ, অর্থোপেডিক্স, ফিজিক্যাল মেডিসিন, ইউরোলজি, নাক-কান-গলা, চক্ষু, জরগরি বিভাগ ইত্যাদি।

**ইসিজি, আন্ট্রাসনোগ্রাম ও রক্ত পরীক্ষা ॥
রোগ নির্ণয় করা গেছে সহজেই**



মেডিকেল ক্যাম্পে প্যাথলজিসহ রোগ-নির্ণয়কারী পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলোর ব্যবস্থা করা সাধারণভাবে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না, কিন্তু কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ঐকান্তিক আগ্রহ ও আন্তরিকতায় এবারের ক্যাম্পে এই বিরল ও প্রায় অসম্ভব কাজটিই করা সম্ভব হয়েছিলো যা এনেছিলো ভিন্ন মাত্রা। ফলে ছিলো ইসিজি, আন্ট্রাসনোগ্রামসহ রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার সুযোগ। পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে দুটি পৃথক ইসিজি মেশিনে মোট ৭১ জনের ইসিজি, ৯৯ জনের আন্ট্রাসনোগ্রাম ও ১২০ জন রোগীর প্যাথলজি পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। অবহেলিত পাহাড়ি জনপদে, যেখানে ন্যূনতম প্রাথমিক চিকিৎসার সুযোগটুকুও হয়ে ওঠে না, সেখানে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে একই জায়গা থেকে রোগ শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়া সত্যিই অভাবনীয়।

এমনও হয়েছে, গাইনি বিভাগে আসা একজন গর্ভবতী মায়ের সমস্যা শুনে চিকিৎসক তাকে তৎক্ষণাৎ পাঠালেন আন্ট্রাসনোগ্রাম করতে; রিপোর্টে জানা গেল, তিনি যমজ সন্তানের মা হতে চলেছেন!



ফলে তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ওষুধ দেয়া সম্ভব হয়। অথচ এ সেবাটুকু পেতেই তাকে অমন ক্লান্ত শরীর নিয়ে ছুটতে হতো অনেক দূরের পথ।

ওষুধ বিতরণ করা হয়েছে ৬৬,৭৬৬ ইউনিট

সব রোগীকে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে বিপুল পরিমাণ ওষুধ। ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, সিরাপ, সাসপেনশন, ক্রিম, অয়েন্টমেন্ট-সবমিলিয়ে



৩,৫১,৮৬৬ টাকার বিভিন্ন ধরনের মোট ৬৬,৭৬৬ ইউনিট ওষুধ। এবারের মেডিকেল ক্যাম্পে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিলো, চার সহস্রাধিক রোগী বিরতিহীনভাবে ওষুধ সংগ্রহ করেছেন কোনোরকম হইচই বা হুড়োহুড়ি ছাড়াই।

এছাড়াও পুরো মেডিকেল ক্যাম্পের ভেতরে-বাইরে শৃঙ্খলা ছিলো চোখে পড়ার মতো, যা রোগীদের সেবাপ্রাপ্তির সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করেছে।



আর এজন্যে কয়েকদিন আগে থেকেই দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন কোয়ান্টামমের অর্গানায়ার ও কোয়ান্টাসহ সর্বস্তরের কর্মীরা এবং ১৩০ জন কোয়ান্টিয়ারের একটি দল।

চিকিৎসকদের অনুভূতি

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে মেডিকেল ক্যাম্পে অংশ নেয়া চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তাদের অনুভূতি। ঢাকার ডেন্টা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের গাইনি বিভাগের রেজিস্ট্রার ডা. মাহিনা মনসুর বলেন, বেশ কজন সন্তানসম্ভবা মা এসেছিলেন, যারা এর আগে কখনোই প্রসব-পূর্ববর্তী কোনো চিকিৎসাসেবা পান নি। তেমনই অনেকে এ চিকিৎসাসেবা ক্যাম্পে এসে পেয়েছেন প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ওষুধ।

এবারই প্রথম মেডিকেল ক্যাম্পে এসেছিলেন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ক্যাপ্টেন ডা. সৈয়দ আহমেদ মোর্তাদা। তিনি বলেন, কোয়ান্টামমে আসার পর মেডিকেল ক্যাম্প থেকে শুরু করে প্রতিটি মুহূর্তেই প্রতিটি ধাপেই মনে হচ্ছে, এখানকার সবখানে আর সবার মাঝে একটা চমৎকার হৃদয়তা। আমি কতটা সেবা দিতে পেরেছি জানি না, তার চেয়ে অনেক বেশি সেবা আমি নিয়ে যাচ্ছি।



ডেন্টাল সার্জনের একটি টিম আগত রোগীদের দন্ত চিকিৎসাসেবা দিয়েছি। এমন সুন্দর একটি পরিবেশে একসাথে এত মানুষের সেবা করতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।

দিনাজপুর জিয়া হার্ট ফাউন্ডেশনের চিফ কনসালটেন্ট ও বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হাসনাইন নান্না তার অনুভূতি জানালেন এভাবে-“আজ থেকে নতুন রূপে ও নতুন উদ্যমে শাফিয়ানে যে চিকিৎসা কার্যক্রমের সূচনা ঘটলো তা চালু রাখার দায়িত্ব আমাদেরই, কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসক আমরা যারা আছি, তাদেরকেই এ দায়িত্বটুকু নিতে হবে।”

উল্লেখ্য, স্থানীয় অধিবাসীদের সুবিধার্থে প্রতিদিন শাফিয়ানে প্রশিক্ষিত প্যারামেডিক্স দ্বারা সাধারণ চিকিৎসাসেবা এবং প্রতি শুক্রবার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করা হচ্ছে।



নবনির্মিত শাফিয়ানের সামনে সারাদেশ থেকে আসা কোয়ান্টাম পরিবারের চিকিৎসকবৃন্দ



গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি একজন চিকিৎসক। কী পরিমাণ ভিজিট রাখলে তা হালাল বলে মনে করতে পারি? আমার মূল ভিজিট ৫০০ টাকা। আমি ফ্রি রোগীও দেখি। কিন্তু মূল বিষয় ৫০০ টাকা নিয়ে। এটাকে কখনো কখনো আমার হালাল মনে হয় না। এছাড়া অপারেশন চার্জ বাংলাদেশে এমনিতেই কম। আমার কাছে আরো কম। গরীব রোগীর জন্যে আরো কম। কিছু অপারেশনে আমার চার্জ থাকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত। যেমন, মেরুদণ্ডের অপারেশন। কখনো কখনো আমার কাছে এটাকেও হালাল মনে হয় না। আমি কীসের মাপকাঠিতে নিজের আয়কে শুদ্ধ ভাবতে পারি?

উত্তর : এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গিটা সবসময় প্র্যাকটিক্যাল বা বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। আপনার রোগীরা জেনেই আসছে যে, আপনার ভিজিট ৫০০ টাকা। যখন একজন জেনে আসছেন এবং স্বেচ্ছায় দিচ্ছেন, এটার মধ্যে হারামের কোনো বিষয় নেই। আর যে রোগী ভিজিট দিতে পারছেন না, তাকে যখন আপনি ভিজিট ছাড়া চিকিৎসা ও পরামর্শ দিচ্ছেন তখন আপনি মানবীয় কাজ করছেন।

আপনি যদি এখন ভিজিট কমিয়ে দেন, আপনার রোগী কমে যাবে। রোগীরা মনে করবে, আপনি হয়তো রোগী পান না, এজন্যে আপনার ভিজিট কম। রোগীর যে উপকারটুকু আপনি করতে পারতেন, সেই উপকার তখন করতে পারবেন না। এটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের বাস্তবতা এবং এখনকার সাইকোলজি। কারণ এখন আমরা কনজুমারিজমের যুগে বাস করছি। সার্জারির ক্ষেত্রেও একই কথা। রোগী মনে করবে যে, এত কম ভিজিট? তার চেয়ে যেখানে ভিজিট বেশি, সেখানেই যাই।

তাই ভিজিট কমানো কোনো সমাধান নয়। বরং চেষ্টা করে লিখে রাখতে পারেন যে, ‘আর্থিক অসুবিধা থাকলে নিঃসংকোচে বলুন’। আর যে টাকাটা আপনি অতিরিক্ত মনে করছেন, সেটি ফাউন্ডেশনে দান করুন। অতিরিক্ত টাকা খরচ করার জন্যে ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক কাজ করছে। এতে দুদিক থেকে উপকার-আপনার পেশাগত জীবনে সাফল্য ও প্রাচুর্য আসবে এবং আপনি যখনই ফাউন্ডেশনে দান করছেন, আপনি শুরু করছেন অগণিত মানুষের দোয়া নিয়ে। কারণ ফাউন্ডেশন থেকে যারা উপকৃত হচ্ছে তাদের সংখ্যা এখন অনেক। ফলে আপনার টাকাটা সাদকায় জারিয়া হচ্ছে। অর্থাৎ সবক্ষেত্রে আপনাকে বাস্তবতাটা বুঝতে হবে।

কিন্তু যখন রোগী দেখবেন, রোগী পয়সা দিক আর না দিক, আপনি বিনামূল্যে চিকিৎসা করুন আর ৫০০ টাকা কিংবা ৫০০০ টাকা নিয়ে করুন, সেবা দিন একই মানের। একই মনোযোগ দিন। তাহলে আল্লাহর রহমত সবসময় আপনার ওপর থাকবে এবং আপনার রিজিক বাড়তে থাকবে। আপনি আল্লাহর কাছে একজন দাতা হিসেবে দাঁড়াতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি একজন ভালো মানুষ হতে চাই। কিন্তু আশেপাশের কিছু মানুষের কারণে ইতিবাচক থাকা যায় না সবসময়। অনেক সময় তাদের কারণে আমার কিছুটা সময় বিরক্তি আর অস্বস্তিতে কাটে। পরে মনে হয়, ইতিবাচক থাকাটা দরকার ছিলো। এক্ষেত্রে কী করণীয়?

উত্তর : আপনি আরেকজনের কথায় বা আচরণে কেন বিরক্ত হবেন? তাহলে তো অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেলেন। এরকম পরিস্থিতিতে বরং আরো আনন্দিত হবেন যে, তার আচরণটা যে খারাপ, এটা আপনি বুঝতে পেরেছেন। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করবেন যে, আল্লাহ! তুমি কত ভালো রেখেছো। আমিও তো এরকম জাহেল হয়ে থাকতে পারতাম! এমন মূর্খ থাকতে পারতাম! না বুঝে মানুষকে কষ্ট দিতে পারতাম! কিন্তু তুমি আমাকে ভালো রেখেছো। শোকর আলহামদুলিল্লাহ! এটা তোমার মেহেরবানি। তোমার দয়া। আমি যেন এরকম আচরণ না করি। অর্থাৎ সবসময় প্রো-একটিভ থাকবেন। সচেতনভাবে শান্ত থাকবেন।

প্রশ্ন : সন্তানরা পুরোপুরি দায়িত্ব পালনের সুযোগ পাওয়ার আগেই যদি মা-বাবা কেউ মারা যান, তাহলে এ ঋণ কীভাবে শোধ করা যাবে?

উত্তর : আসলে মা-বাবার ঋণ কখনো শোধ হয় না। কিন্তু মা-বাবা মারা গেলে আপনি তাদের নামে সামর্থ্যমতো সৎকর্ম করতে পারেন। দান করতে পারেন, সাদকায় জারিয়া করতে পারেন। সেটা তাদের আমলনামাতে যুক্ত হতে থাকবে এবং সন্তানদের দিক থেকে এটাই সর্বোত্তম কাজ।

প্রশ্ন : শোনার ক্ষমতা একদম কমে গেছে, বিশেষত মোবাইল ফোনে কথা বেশি শুনলে অস্থির লাগে, অস্বস্তি লাগে। করণীয় কী?

উত্তর : শুধুমাত্র প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন। অত মোবাইলে শোনার দরকারটা কী? অন্যের প্রয়োজন হলে অন্যেরা যেভাবে হোক আপনাকে জানাবে। যেহেতু আপনি অস্বস্তি বোধ করছেন, আপনার অস্থিরতা বাড়ছে, তাই আপাতত মোবাইল ফোন যত কম ব্যবহার করেন তত ভালো।

প্রশ্ন : রোগবিহীন, অন্তত জটিল রোগবিহীন জীবনযাপনের উপায় কী হতে পারে?

উত্তর : যখনই আপনি সং জীবনযাপন করবেন, আপনার রোগ-ব্যাদি এমনিতেই কমে যাবে। এটা হচ্ছে একটা দিক। আবার কিছু রোগ আছে, আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা।

যেমন, হযরত আইয়ুব (আ)-এর জন্যে কুষ্ঠরোগ ছিলো একটা পরীক্ষা। তিনি তাতে এমনভাবে আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, শরীরে পোকা চলে এসেছিলো। কেউ তার কাছে যেত না। একবার একটা পোকা শরীর থেকে পড়ে গেছে, তিনি আবার সেটি উঠিয়ে দিয়েছেন এই মনে করে যে, সবাই তো আমাকে ছেড়ে গেছে, তুই তো অন্তত আছিস, থাক। এটা হচ্ছে পরীক্ষা।

কিন্তু যা আপনার অনাচার, অনিয়মের ফলে হবে, এটা কোনো পরীক্ষা নয়। এটা হচ্ছে প্রতিফল। দুটো আলাদা ব্যাপার। তবে সাধারণভাবে আপনি যদি সং জীবনযাপন করেন, হালাল খাবার খান এবং যে সমস্ত খাবার স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর, সেগুলোকে এড়িয়ে চলেন এবং নিয়মিত ব্যায়াম করেন, শরীরের যথাযথ যত্ন নেন, আপনার অসুখবিসুখ কমে যাবে। আপনি অনেক সুস্থ থাকবেন।

প্রশ্ন : আমার ছেলের জন্যে কয়েকবার দোয়া ও হিলিং-এ নাম দিয়েছিলাম পড়ালেখায় মনোযোগী ও দুষ্টিম দূর হওয়ার জন্যে। কোনো উপকার পাই নি। এজন্যে কী করবো, গুরুজী? বর্তমানে ওর বয়স নয় বছরের বেশি। এখনো ও পড়ালেখায় অমনোযোগী ও দুষ্টিম করে।

উত্তর : নয় বছরের বাচ্চা দুষ্টিম করবে না, তো কি ৯০ বছরের বুড়ো দুষ্টিম করবে? নয় বছরের বাচ্চাই তো দুষ্টিম করবে। দুষ্টিম যে করছে এজন্যে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন যে, আমার বাচ্চা প্রাণোচ্ছল আর উদ্যমী। সে কিছু করতে চায়। আপনি তাকে সবসময় ভালো ও অর্থপূর্ণ কাজে উদ্দীপ্ত রাখতে পারছেন না, এটা আপনার ব্যর্থতা। তাই আপনি এ ব্যাপারে সচেতন হোন। তাকে এমন কাজ দিন, যেটা ভালো। তাকে ভালো কাজ দিলে এবং সঙ্গ দিলে সে ভালো কাজই করবে।

দুই নম্বর হচ্ছে, হিলিং তো কয়েকবার নাম দেয়ার জন্যে নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত হিলিং চলতে থাকবে। কারণ, আপনার ছেলেকে ঠিক করার জন্যে তো আপনাকে লেগে থাকতে হবে। দুই-তিনবার নাম দিয়েই যদি আপনি হতাশ হয়ে যান যে, হিলিং-এ নাম দিয়ে কিছু হয় নি, তাহলে কীভাবে হবে?

যতক্ষণ ছেলে ঠিক না হবে, ততক্ষণ হিলিং চলতে থাকবে, সদকা চলতে থাকবে। অর্থাৎ আপনার লেগে থাকতে হবে। এই লেগে থাকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটা কাজে নেমে কয়েকদিন পরেই আমরা হতাশ হয়ে যাই-আর হলো না বোধহয়! আর পারলাম না বোধহয়! কিন্তু আপনি তো শুরুই করলেন না এখনো, পারলেন কি পারলেন না, সেটা বুঝবেন কীভাবে?

ছেলের বয়স মাত্র নয় হয়েছে, এখনই যদি আপনি হাল ছেড়ে দেন, যখন ছেলের বয়স ১৫/১৬/১৭ হবে, তখন কী হবে? আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার ছেলে-ঠিক হবে না কেন? আল্লাহ তুমি ঠিক কর। তুমি দিয়েছো, তোমার আমানত, তুমি ঠিক কর। তোমার পথে রাখো।

প্রতিদিন তার জন্যে মেডিটেশন করবেন, মনছবি করবেন, তার জন্যে দোয়া করবেন। হিলিং-এ নাম দেবেন এবং তার জন্যে প্রত্যেক দিন সদকা দেবেন, ২ টাকা হোক, ৫ টাকা হোক, ১০ টাকা হোক, ৫০ টাকা হোক, ১০০ টাকা হোক। আপনার সামর্থ্য অনুসারে সদকা দিতে থাকবেন প্রত্যেক দিন। এই নিয়মিত সদকা দেয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়। যতক্ষণ ছেলে ভালো না হচ্ছে আপনাকে বিশ্বাস আর ইতিবাচকতা নিয়ে লেগে থাকতে হবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

অন্যের কল্যাণ না করলে নিজের সত্যিকারের কল্যাণ হয় না।

আমি আজ থেকেই অন্যের কল্যাণে কিছু না কিছু করবো।

নতুন কার্যালয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মা-জী রাজশাহীতে কোয়ান্টামের বাণী ছড়িয়ে দিতে হবে

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মা-জী নাহার আল বোখারী ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী সফর করেন। ৭ ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধেয়া মা-জী কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারের নতুন কার্যালয় উদ্বোধন করেন। নতুন অফিসে নতুন উদ্যমে—এই থিম নিয়ে শুরু হলো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারের কর্মচাঞ্চল্য।

নতুন কার্যালয় উদ্বোধনের পর শ্রদ্ধেয়া মা-জী বলেন, রাজশাহীতে কোয়ান্টামের বাণীকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের

রাগ-ক্ষোভ-ঈর্ষা অর্থাৎ সকল নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত হয়ে সজ্জবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। সজ্জবদ্ধতাই কোয়ান্টামের মূল শক্তি। আলোচনার পর মা-জী বিশেষ নিরাময় ও মনছবির মেডিটেশন পরিচালনা করেন।

৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মা-জী রাজশাহীর বোধিপুর পরিদর্শন করেন। গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারদের নিয়ে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় বোধিপুর্বে। আত্মিক উন্নয়নের নানা দিক নিয়ে মা-জী আলোচনা করেন এবং



মেডিটেশন পরিচালনা করেন।

একই দিনে বিকেল ৫টা থেকে ৬টায় রাজশাহী সেন্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উত্তরবঙ্গের দায়িত্বশীলদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক। এ বৈঠকে সজ্জের নির্দেশনা অনুসরণের বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেন মা-জী।

এছাড়াও চারপাশের মানুষকে প্রতি শুক্রবার সাদাকায়নে একাত্ম করা এবং সাদাকায়ন কার্যক্রমকে আরো আকর্ষণীয় করার বিষয়ে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এরপর সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রো-মাস্টারদের নিয়ে মা-জীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রোগ্রাম।

‘প্রতিটি অর্জনই হোক নতুন শুরু, নতুন যাত্রার প্রস্তুতি’—এই অনুপ্রেরণা নিয়ে সজ্জবদ্ধ হয়ে কাজ করাই এখন সেন্টারের প্রত্যেক আর্ডেন্টার, কোয়ান্টিয়ারসহ সকল স্তরের কর্মীর মনছবি।



এপ্রিল ২০১৪-এর কর্মসূচি

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও নিরাময় কার্যক্রম

মিরপুর : ৪ ও ৫ এপ্রিল

কোয়ান্টাম শিক্ষার্থী কার্যক্রম

কেন্দ্র : ১৮ ও ১৯ এপ্রিল

কোয়ান্টাম হিলিং ও সাইকি কার্যক্রম

কেন্দ্র : ২৫ ও ২৬ এপ্রিল

জীবনে সফল হওয়ার পথ প্রথমায়ন

বনানী : ৪ ও ৫ এপ্রিল

কেন্দ্র : ১৮ ও ১৯ এপ্রিল

বাংলা বাচন পরিশীলন কর্মশালা

বনানী : ২৫ ও ২৬ এপ্রিল

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রম

পুরষ : ৪ ও ৫ এপ্রিল

মহিলা : ২৫ ও ২৬ এপ্রিল

কোয়ান্টাম বেসিক কম্পিউটিং প্রোগ্রাম

প্রতি সপ্তাহে শুক্রবার থেকে সোমবার

কোয়ান্টাম বেসিক হার্ডওয়ার প্রোগ্রাম

প্রতি মাসে দুই শুক্রবার-সোমবার

রাজশাহীতে বিএনসিসি-র বিশেষ প্রশিক্ষণে ও চট্টগ্রামের পটিয়ায় অজেয় ১৯

২৮ জানুয়ারি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি)-এর ৪৪৫ জন ক্যাডেটকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় অজেয় ১৯ কার্যক্রম। রাজশাহী পোস্টাল একাডেমি প্রাঙ্গণে ২৪ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া বিএনসিসি-এর মহাস্থান রোজমেন্টের বার্ষিক প্রশিক্ষণে অংশ নেন রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অর্ধশতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ সকল ক্যাডেট।

এবারের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ক্যাডেটদের রক্তদানে সচেতন করতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমন্ত্রণ জানায় কর্তৃপক্ষ। অর্গানিয়ার ইঞ্জিনিয়ার প্রাণজিৎ লাল শীল তার তথ্য-উপাত্তনির্ভর আলোচনায় রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পরে রক্তদানের ওপর ফাউন্ডেশন নির্মিত ডকুমেন্টারি ‘রক্তদান-বৈচ্ছে লক্ষ প্রাণ’ দেখানো হয়।

১৯ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের পটিয়ার মনসা স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত হয় অজেয় ১৯ কার্যক্রম। আর্ডেন্টার জিনাত রুমানা আলমের পরিচালনায় এ অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন অর্গানিয়ার কাজী আবু জাররার। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ২৫ শিক্ষার্থী। এতে রক্তদানের উপকারিতা তুলে ধরে অংশগ্রহণকারীদের নিয়মিত স্বেচ্ছা রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করা হয় ও কোয়ান্টাম মেডিটেশন সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হয়। কোয়ান্টামের বিভিন্ন প্রকাশনা নিয়ে ছিলো সেলস কর্নার এবং ব্লাড গ্রুপিং-এর ব্যবস্থা।

মনসা স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মিজবাহ-উর-রহমান-এর সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ কার্যক্রমটি পরিদর্শন করেন পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকেয়া পারভীন।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কোয়ান্টাম সভা

২৩ ফেব্রুয়ারি কোয়ান্টাম মিডিয়া সেল-এর উদ্যোগে জাতীয় জাদুঘরের ৩৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় একটি কোয়ান্টাম সভা। এ সভায় ‘প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য ও সাফল্যের জন্যে মেডিটেশন’ বিষয়ে আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় আলোচক সায়েরা মাহবুব সীমা এবং মেডিটেশন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন আর্ডেন্টার ও যুগ্ম সচিব সালমা নাসরিন। জাতীয় জাদুঘরের চেয়ারম্যান এম. আজিজুর রহমান ও মহাপরিচালক প্রকাশ চন্দ্র দাস এতে উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লায় পারিবারিক ওয়ার্কশপ

৭ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা শাখার উদ্যোগে কুমিল্লা জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পারিবারিক ওয়ার্কশপ। ‘সুখী পরিবার’-এর মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ওয়ার্কশপটি। আলোচনা পর্বে ছিলো-‘পরিবারের সদস্যদের মেডিটেশনে উদ্বুদ্ধ করার গুরুত্ব ও করণীয়’, ‘পারিবারিক মনছবি কেন প্রয়োজন?’ এবং ‘পারিবারিক মনছবি বাস্তবায়নে সেবা ও দানের গুরুত্ব’। আলোচনা করেন অর্গানিয়ার মারুফ ইবনে মাহবুব। এরপর দেখানো হয় দুটি ডকুমেন্টারি ‘আসুন সুস্থ থাকি’ ও ‘নিয়মিত দান আনে কল্যাণ’। ওয়ার্কশপে গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েটসহ মোট ২৮২ জন উপস্থিত ছিলেন।

আবশ্যিক

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল ও কলেজের জন্যে শিক্ষক/শিক্ষিকা/আবাসিক শিক্ষক (ন্যূনতম অনার্স পাশ), বিজ্ঞান বিভাগের জন্যে (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, জীব বিজ্ঞান, উচ্চতর গণিত) শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যিক। বিএড ও নিবন্ধনকৃত প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। শিশুকাননের শিক্ষার্থীদের দেখাশোনার জন্যে ব্রাদার, সিস্টার (ন্যূনতম এসএসসি পাশ) ও সিকিউরিটি গার্ড আবশ্যিক। আগ্রহী প্রার্থীরা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন :

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭

কোয়ান্টাম

৭

বুলেটিন

কোয়ান্টাম সফর ॥ শিশুবন্ধু ডা. এম আর খান ও বিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী



কোয়ান্টাদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন দুই অভিভাবক



শিশুসদনের মেয়েশিশুদের সাথে কোয়ান্টামের দুই অভিভাবক



কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের সংযোগ পথে নবনির্মিত কালভার্ট উদ্বোধনের পর প্রার্থনারত

কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে ডিআইইউ-এর উপাচার্য ড. লুৎফর রহমান তথ্যপ্রযুক্তিতে দক্ষ হতে হবে



১০ ও ১১ মার্চ কোয়ান্টাম সফর করেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. এম লুৎফর রহমান। ১০ মার্চ কোয়ান্টামে কোয়ান্টাদের পরিবেশনায় ব্যান্ডবাদন আর বিউগল-এর সুর মূর্ছনায় স্বাগত জানানো হয় তাকে। একই দিনে তিনি সেন্টার ভ্রমণ করেন এবং

বিভিন্ন স্থাপনা ও ভাস্কর্য পরিদর্শন করেন।

সন্ধ্যায় কামরুল চত্বরে কোয়ান্টাদের বর্ণিল পরিবেশনায় উপভোগ করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পরদিন ১১ মার্চ শহীদ ময়দানে কোয়ান্টাদের প্যারেড ও ডিসপ্লে পরিদর্শন করেন তিনি। এসময় তাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। এরপর তিনি কোয়ান্টাম

কসমো স্কুল এবং নবনির্মিত টেবিল টেনিস হল পরিদর্শন করেন।

কসমো স্কুল জিমেনেসিয়াম হল-এ কোয়ান্টাদের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতালব্ধ ও দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন ড. এম লুৎফর রহমান। জীবনে লক্ষ্যের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, যুগে যুগে পৃথিবীতে যারাই বড় হয়েছেন, মহান হয়েছেন তাদের প্রত্যেকেরই জীবনে একটা লক্ষ্য ছিলো, মনোহবি ছিলো।

মনোহবি অর্জনের জন্যে মেধাকে কাজে লাগাতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির এই যুগে জ্ঞানই শক্তি। বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে হলে আমাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রথম সারির দক্ষতা অর্জন করতে হবে। জাতিগত উন্নয়নের জন্যে দেশের মানুষকে সম্পদে পরিণত করতে হবে।

তার সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ডীন প্রফেসর মাহবুবুল হক মজুমদার। তিনি কোয়ান্টাদের চমৎকার প্যারেড ও ডিসপ্লে পরিদর্শনের পর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন, কর্মসূত্রে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সুযোগ তার হয়েছে। কিন্তু কসমো স্কুলের শিক্ষার্থীদের এত সুশৃঙ্খল আর স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশনা তাকে মুগ্ধ করেছে।

কোয়ান্টাদের পারদর্শিতার জন্যে প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান ও প্রফেসর মাহবুবুল হক মজুমদার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান।

তারা দুজনই সস্তীক কোয়ান্টাম সফর করেন।